Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 409–416
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

হাসান আজিজুল হকের প্রকৃতি চেতনা : প্রেক্ষিত তাঁর নির্বাচিত ছোটগল্প

সাহাবুল মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : sahabulmondal764@gmail.com

Keyword
অবক্ষয়পীড়িত, সামন্ততান্ত্রিক, বেআব্রু, মধ্যবিত্ত, রাঢ়বঙ্গ, শোষকশ্রেণি, হাড়হাভাতে, জীবনধর্ম, জীবনসংগ্রাম, অন্ত্যজশ্রেণি

Abstract
বাংলা দেশের ছোটগল্পের প্রাঙ্গণে হাসান আজিজুল হক অনন্য ব্যক্তি। বিংশ শতকে ষাটের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যের যে নবযাত্রা ঘটেছিল তার অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন হাসান আজিজুল হক। উত্তাল চল্লিশের দশকের প্রবেশমুখে রাঢ়বঙ্গে জন্ম নেওয়া এই খ্যাতিমান কিংবদন্তীতুল্য কথাশিল্পী দেশে বিদেশে ঈর্ষণীয় আকর্ষণ কেড়েছেন পাঠক-সমালোচকের, অতিক্রম করেছেন একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি। তাঁর হাতে বাংলা ছোটগল্পের বাঁকবদল ঘটেছে –জীবন ও পরিবেশের অভিজ্ঞ রূপভাষ্যকার তিনি। জীবনকে তিনি দেখেছেন সৃষ্টির নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে এক সূত্রে গেঁথে। তাঁর গল্পে উদ্বাস্তু সমস্যা, মধ্যবিত্তের নানামাত্রিক ধ্বস ও জীবনসংগ্রাম, মানুষের অবদমিত যৌন- আকাঙ্ক্ষা, দুর্ভিক্ষের কারণে সৃষ্ট মৃত্যুর বিভীষিকা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংসতা, যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা, কালোবাজারির রমরমা ব্যবসা ইত্যাদির ছবি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় গ্রামীণ মানুষের জীবন ও প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যময় ছবি। অবিভক্ত বাংলার রাঢ়বঙ্গের বর্ধমানের যবগ্রামে তাঁর জন্ম এবং গ্রামেই মানস গঠনের ষোলো বছর অতিক্রম, দেশবিভাগের কারণে স্থানান্তরিত হয়ে বাস্তভিটা ছেড়ে দক্ষিণবঙ্গের খুলনায় বসবাস, বি এল কলেজে তারুণ্যের দুরন্ত কাটানো, অতঃপর উচ্চশিক্ষার্থে এবং চাকুরির সূত্রে উত্তরবঙ্গের রাজশাহী শহরে স্থায়ী আবাস–এই তিন বঙ্গের ভৌগোলিক অভিজ্ঞতাই হাসানের মানস গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। ছোটগল্পের যে প্রাণ, সামান্য কিছুতে অসামান্যের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা, তা তাঁর রক্তেই মিশে ছিল। অখিল ক্ষুধা, অফুরান প্রাণচাঞ্চল্য, দুরন্তপনা নিয়ে প্রকৃতিতে চষে বেড়িয়েছেন বালক হাসান, তাকিয়েছেন বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার চোখে। বিভূতিভূষণের অপুর মতোই প্রকৃতিই ছিল হাসানের জীবনের সবচেয়ে বড়ো পাঠশালা। বর্ধমানের যবগ্রামে থাকাকালীন সময়ে রাঢ়ের রুক্ষ, ধূসর, খটখটে প্রকৃতির বিবর্ণতা হাসানের চোখে ধরা পড়ে ভয়ানক খেদ ও বাস্তবতা নিয়ে। হাসান আজিজুল হকের জীবনে প্রকৃতির সহজাত সত্তাটি স্নিগ্ধ মধুরতা ও স্বপ্নময়তা নিয়ে ধরা দেয় যখন স্থানান্তরিত হয়ে দক্ষিণ বাংলার খুলনায় আসেন। রাঢ়ের নির্মেদ, রুক্ষ, নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছেলে বিস্ময় বিমূঢ়ের মতো লক্ষ করেন নদী নালা খাল বিল, পাহাড় ও গাছ লতাপাতা নিয়ে দক্ষিণবাংলা সবুজের দেশ,

স্বপ্ন ও রূপকথার দেশ। এখানে তাঁর শিল্পীমন ও চোখের তৃষ্ণা মেটাবার অপার সুযোগ। রাঢ়বঙ্গের বর্ধমানের যবগ্রামের সেই জিজ্ঞাসু বালক দক্ষিণবঙ্গের সবুজ প্রকৃতির পাঠ সমাপ্ত করে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির রূপ-রস গ্রহণ করে পরিপুষ্ট ডালপালা বিস্তৃত বটবৃক্ষের মতো বাংলা ছোটগল্পে মহীরূহ হয়ে উঠেছেন। রাঢ়বঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ-উত্তরবঙ্গ এই তিন ভূখন্ডের ত্রিমোহনায় দণ্ডায়মান অপরাজেয় লড়াকু ক্ষত্রিয় হাসান আজিজুল হকের সৃষ্ট চরিত্ররাও প্রায় এই তিন অঞ্চলের ব্রাত্যজন, সাধারণ মানুষ। আর এই জীবনকাব্যের শিরা-উপশিরায় নিরন্তর বহমান প্রকৃতির অমৃত ও গরল। বিভূতিভূষণের মতো শিশুর সরল মন ও সবুজ চশমা চোখে নিয়ে হাসান প্রকৃতির দিকে তাকান নি, বরং তাকিয়েছেন মানিকের মতো নিরেট সাদা ও নিরাসক্ত চোখে। তাঁর গল্পের শরীরের প্রকৃতি আর মানুষ এক অভিন্ন সত্তা, অভিন্ন চরিত্র হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে।

Discussion

হাসান আজিজুল হক উনিশ'শ সাতচল্লিশ সালের দেশভাগের পর চুয়ান্ন সালে রাঢ়বঙ্গ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরই ফলে গ্রাম বাংলার জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় গড়ে ওঠে। হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের জীবন, ভূপ্রকৃতি ও প্রতিবেশ সম্পর্কে আলোকপাত করতে আমরা তাঁর 'শকুন', 'আমৃত্যু আজীবন' এবং 'জীবন ঘষে আগুন'— এই তিনটি গল্পকে আলোচনার সুবিধার্থে বেছে নিলাম। হাসান আজিজুল হকের প্রথম ''সিগনেচার গল্প'' 'শকুন' গল্পটির বিষয় রাঢ় অঞ্চলের এক রুক্ষ কঠিন নির্মম পরিবেশে রূপায়িত এক অর্ধমৃত দুর্বল শকুনিকে ঘিরে একদল ছেলের হৃদয়হীন বীভৎস খেলায় মেতে ওঠার কাহিনী। রাঢ়ের প্রকৃতি ও পরিবেশ গল্পটির অস্থি মজ্জায়। 'শকুন' প্রকৃতির রাজ্যে অশুভ ও অমঙ্গলের প্রতীক। হিংস্র ভয়ানক প্রকৃতির এই পাখিটির মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার বীভৎস্য দৃশ্য প্রাণীজগতে হিংস্রতার চরম নিদর্শন। শোষণে নিষ্পেষণে লুন্ঠণে মানুষ ও প্রকৃতি এই প্রাণীটির মতোই স্বাপদ। সমাজমনস্ক এই কথক জীবনের প্রকৃত বাস্তবকে তুলে ধরতে গিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে নয়, বরং বিপরীত পিঠের নিষ্ঠুরতাকে চালু ছবির মতো তুলে এনেছেন, কখনও ভয়ানক পরিহাস ও শ্লেষের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। 'শকুন' গল্পটি যৌনতাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও সমাজের অবক্ষয়ের মূল কারণ যে আর্থ-রাজনৈতিক জীবনের নানা অসঙ্গতি অসামঞ্জস্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে লেখক তা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—

> ''সুদখোর শোষকেরা আমাদের সমাজে অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে পরিচিত।শকুন যেমন মৃত প্রাণীর মাংসে জীবনধারণ করে থাকে, আমাদের সমাজেও তেমনি নিষ্ঠুর ধনিক শ্রেণী মৃতপ্রায় অসহায়, দুঃস্থ মানুষের উপর তাদের নগ্ন থাবা প্রসারিত করে থাকে।''[১]

গ্রামের কয়েকটি ছেলে দিনের আলোয় ফিরতে না পারা একটি শকুনকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে। তাদের মত্ততার কবলে পড়ে শেষপর্যন্ত শকুনটার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে ছেলেরা খেলাচ্ছলে তার গা থেকে একটি একটি করে সমস্ত পালক খসিয়ে নিয়ে তাকে অসুন্দরের প্রতিমূর্তি বানিয়ে ফেলেছিল। তারপর ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে ঢুলতে ঢুলতে গ্রামের মধ্যে ঢুকতেই তালগাছ ও নেড়া বেলগাছের ছায়ায় সাদা মতো কী যেন দেখতে পেল। সেটা অন্যকিছু নয়—কাদু শ্যাখের রাঁঢ় বোনের সঙ্গে জমিরুদ্দির অবৈধ যৌন মিলনের ফলে জাত একটি অপূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর অস্পষ্ট দৃশ্য। কথাটি রাষ্ট্র হয়ে যেতেই মানুষ মৃত শিশুটির পাশে জড়ো হতে থাকে। লেখক বলেন—

> ''দিনের চড়া আলোয় তাকে অদ্ভুত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মরা শকুনটার মতোই।''[২]

হাসানের এই গল্পের ছেলেরা যে সমাজ পরিবেশে বেড়ে উঠেছে সেখানে দেখেছে মোল্লাতন্ত্রের দাপট, মোড়ল তথা সমাজপতিদের অহংকার আস্ফালন শোষণ ও ব্যাভিচারের নির্লজ্জ ইতিহাস। এদের দুঃশাসনেই মানুষ বেঁচে থাকে অসহনীয় দারিদ্র্য, নোংরা ক্লিন্ন এক পরিবেশে, মৃত্যুকে নিরন্তর সঙ্গী করে এক পাশবিক সংগ্রামে। তবে এই অত্যাচারী

শক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। একতা, সম্প্রীতি ও সম্মিলিত শক্তির কাছে উদ্ধত শক্তিকে নতজানু হতেই হয়— এটাই সভ্যতার ইতিহাস, এটাই বাস্তব। ছেলের দলের শকুনটাকে ধরতে গল্পকার রাঢ়ের যে রুক্ষ কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণণা দিয়েছেন, প্রতিকূল পরিবেশে বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত শকুনটাকে ধরার যে বর্ণনা গল্পকার দিয়েছেন, তা শুধুমাত্র সংকীর্ণ প্রতিকূল পরিবেশ হিসাবেই থেমে থাকেনি, তা যেন দুর্দমনীয় লড়াকু যোদ্ধাদের জীবনের সামনে পর্বতপ্রমাণ বাধা বিপত্তিরই দ্যোতক হয়ে উঠেছে। অত্যাচারী শয়তানের শয়তানি নাশ করতেই ছেলের দল এক 'মরণ প্রতিজ্ঞায়' মেতে উঠেছে—

> "...এবার আল টপকে উঁচু-নিচু এবড়ো -খেবড়ো জমি পেরিয়ে পগার আর শিশু শস্যের ওপর দিয়ে— শেয়ালকুলের কাঁটায় জামা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মরণ প্রতীজ্ঞায় মেতে উঠল ছেলের দল।"[৩]

শকুনটাকে মোল্লা, মোড়ল কিংবা সুদখোর মহাজনের প্রতীকে ধরার মধ্যে লেখকের তীক্ষ্ণ সচেতন সমাজবোধ ও মুনশিয়ানা ফুটে উঠেছে। প্রথমদিকে শকুনটার মধ্যে ছেলেরা প্রত্যক্ষ করেছিল একটা লুকিয়ে যাওয়ার ভাব। পারলে কোনো পুরানো বটের কোটরে বা কোনো পুরীর বিকট আবাসে কিংবা নদীর ধারে বেনাঝোপের নীচে শেয়ালের গর্তে। পুরানো বট বা পুরীর ভাবনায় স্বতঃই উঠে আসে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পুরাতন মূল্যবোধ, অহংকার এবং শাসন শোষণের বিশাল আয়োজন। অন্যদিকে নদীর ধারের বেনাঝোপে আছে আমজনতার প্রাত্যহিক ক্লিন্ন বাস্তবতা। কিন্তু হাসান শকুনটির লুকানোর চেষ্টা বেনাঝোপে বলেননি, বলেছেন, বেনাঝোপের নীচে শেয়ালের গর্তে। শেয়াল উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটির ধূর্ত স্বভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর এসবই শকুনটির অনুসঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে মোল্লা-মোড়ল সুদখোর ব্যবসায়ীর প্রকৃতি তথা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যকেই গভীরতা ও ব্যাপ্তিদান করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের এইসব বিস্তারিত বর্ণনার মধ্য দিয়ে অবক্ষয়পীড়িত বন্ধ্যা সমাজকে যেন একেবারে বেআব্রু করে দিয়েছেন গল্পকার।

হাসান আজিজুল হকের এই গল্পে নৈশপ্রকৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নিয়ত সত্যসন্ধানী অভিযাত্রী অন্তর প্রকৃতির অন্ধকার পরিবেশ থেকে যেন 'সত্য' নিষ্কাশন চালিয়েছে। অন্ধকার অশুভের প্রতীক, জীবনের কদর্যতা ও পঙ্কিলতা অন্ধকারেই প্রকাশিত হয়। গল্পটির ঘটনা শুরু হয়েছে সন্ধ্যার পর যখন 'ফিকে অন্ধকারের মধ্যে নিকষ একতাল সজীব অন্ধকারের মতো প্রায় ওদের মাথা ছুঁয়ে সামনের পড়ো ভিটেটায় নামল সেটা'। শকুনটাকে চিহ্নত করার আগেই সর্দার ছেলেটির চোখে তা ধরা পড়েছে 'অন্ধকারের তাল' হিসাবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই অন্ধকার এখানে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। অবক্ষয়পীড়িত অন্ধকার সমাজের মধ্যে জীবনের কদর্যতা ও পঙ্কিলতা নিয়ে আরও 'একতাল সজীব অন্ধকার' (শকুনটি) এসে উপস্থিত।অবক্ষয়পীড়িত বন্ধ্যা বাংলাদেশের ঘুণ-ধরা সমাজে মোল্লা-মোড়ল ও সুদখোর মহাজনের মতো শকুনের দল তাদের নোংরা কদাকার পাখা মেলে দিয়েছে। হাসান আজিজুল হক প্রাকৃতিক পরিবেশে যে অন্ধকারকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেই অন্ধকারকে বুকে নিয়েই চারিপাশের হাড় হাভাতে মানুষ এক অন্ধকার বিবরে ধুঁকে ধুঁকে মরে। আবার এই মানুষগুলিই সংগ্রাম করে বাঁচে।সারারাত ধরে রাতের অন্ধকারে ছেলেগুলি যখন অচৈতন্য হয়ে ঘুমোয়— তখন দিনের আলোয় গল্পকার আমাদের নিয়ে যায় অন্য এক জগতে, যেখানে জমিরুদ্দি ও কাদুশেখের বিধবা বোনের ব্যভিচারের ফসল এক অপরিণত শিশুর লাশ। আমাদের সমাজব্যবস্থার অন্ধকারাচ্ছন্ন বীভৎসতা, হতদরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিদিনের জীবন যাপনের বিবর্ণ অন্ধকার— সবই হাসান তাঁর গল্পের স্তরীভূত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের দেখিয়েছে।

পশ্চিমবাংলার দিগন্ত বিস্তৃত বিলকে হাসান আজিজুল হক শৈশব ও কৈশোর পর্যন্ত খুব কাছ থেকে দেখেছেন, যৌবনেও দেশত্যাগের আগে পর্যন্ত বিল ছিল তাঁর কাছে নিত্যসহচরের মতো, নিত্যকর্মে তার সঙ্গে হয়েছে চেনা-জানা। দেশ ত্যাগের পরেও শৈশব থেকে যৌবনের স্মৃতি-বিজরিত বিলকে নতুন করে ফিরে পেয়েছেন খুলনার ফুলতলায়, তার দ্বিতীয় আবাসে। পশ্চিমবঙ্গীয় প্রকৃতির সঙ্গে সেখানকার মানুষও তাঁর গল্পে ছায়া ফেলেছে বারবার, মানুষের স্বভাবে ও কথাবার্তায় সেখানকার স্মৃতিই হয়ত কখনো কখনো দুর্মরতম হয়ে উঠেছে কিন্তু সে প্রেরণা প্রাদেশিকতায় পাংশুল হয়ে ওঠেনি। বিস্ময় ব্যঞ্জনায় ও চারিত্র্যে তা দৈশিকতার সীমা ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশের শোষিত কৃষকদের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের জন্য উন্মুখ হয়েছে।

হাসান আজিজুল হকের 'আমৃত্যু আজীবন' গল্পটির বিষয় হল পূর্ববঙ্গের কৃষকদের অফুরন্ত সংগ্রামী চেতনা। নিয়তি নির্ধারিত ও প্রকৃতি তাড়িত কৃষকসমাজের দৈন্য ও সংকটের চিত্রই গল্পকার তুলে ধরেছেন। গল্পে করমালি একজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভাগচাষী কৃষক। তার নিজস্ব তেমন জমিজমা নেই। শুধুমাত্র বাড়ির বিল ঘেষে কিছু পতিত জমি আছে। নদী-খাল-বিল-হাওড়ের এই জনপদের জনজীবনের নিয়ন্ত্রণ, প্রভাব বা পরিচালনা যাই বলি কেন সবই প্রকৃতির হাতে ন্যাস্ত। তাই, নদী-বিল শুকালে জনপদের জীবনেরও প্রাণশক্তি ফুরিয়ে আসে। হাসানের গল্পে নদী-বিল-হাওর এতটাই গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে যে কখনও সেসব চরিত্রের মতোই ভূমিকা পালন করে। 'আমৃত্যু আজীবন' গল্পের করমালির কাছে বিল তারই জীবনের মতো অচেনা, দূর্জ্ঞেয় জমাট রহস্যের জায়গা।বিল তাকে স্বপ্ন দেখায়, বিলের মাটি, ঘাস, বাতাস সকলেরই সাথে করমালির আছে আত্মিক ও মায়ার বন্ধণ। এক বাদলার দিনে করমালি ও রহমালি দুই বাপ বেটায় মিলে বিলের লাগোয়া তাদের একটুকরো পতিত জমি পরিষ্কার করতে গেলে বিলকে কেন্দ্র করে করমালির মানসনেত্রে হতভাগ্য চাষী-জীবনের এক স্বপ্নময় আনন্দঘন মুহূর্ত ভেসে ওঠে—

> "এইভাবে করমালি প্রায় বিনা চেষ্টায় দেখতে পায়, বিলের সঙ্গে লাগোয়া তার নিজের রক্তের ভিতর থেকে জন্ম দেওয়া আত্মজের মতো একখন্ড জমি কচি ধানে সেজে লাফিয়ে উঠল হাওয়ায়।"[৪]

সেই বৃষ্টির মধ্যে করমালি জমি পরিষ্কার করতে করতে সাপের সাক্ষাৎ পায়। সেই সাপ করমালির ধলা বলদটিকে কাটল। করমালি নিজস্ব কিছু জমি ও অন্যের জমি ভাগে চাষ করে,বলদ না থাকলে তা সম্ভব নয়— জমির মালিক জমি কেড়ে নেবে। তাই তার সামনে অন্ধকার শূন্য দিনগুলি পাক খেতে লাগল, যা শ্রেণিবিভক্ত সমাজের চাপের ফল। এক লহমায় করমালির স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে ভবিষ্যতের পথে অন্ধকার নেমে আসে। করমালির মনে হয় বলদটার বদলে আত্মজ রহমালি মরে গেলেও তার এতটা কষ্ট হত না। মালিকের কাছে বহু কাকুতি-মিনতি করে সাত দিনের সময় চেয়ে নেয় করমালি। যে করেই হোক সে গরু ছাড়া কাজ করবে। রহমালি এবং তার মা এই চরম দুঃসময়ে বলদের বদলে নিজেরা জমি চষে ফসল ফলানোর প্রস্তাব করে করমালির কাছে। পরদিন আবার জমির বাকি আগাছাটুকু পরিষ্কার করতে গিয়ে তারা আবার সাপটাকে দেখতে পায়। বিল করমালিকে যেমন ভবিষ্যতের নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছে তেমনি শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দীক্ষাও সে বিলের কাছ থেকেই পেয়েছে। তাই শোষণ ও নিপীড়নের প্রতীক সাপের লেজ কেটে নিয়ে করমালির বোধোদয় ঘটে শোষনের হাত থেকে ওদের মুক্তি নেই। তার ভাষায় —

> "কেউ মারিতে পারে না, ওরা মারা যায় না কোনোদিন।"[৫]

অবশেষে প্রকৃতির রুদ্ররূপ বজ্রাঘাতে করমালিকে প্রাণ হারাতে হয়, করমালিরাই হারে এবং সাপের মতো ছোবলকারী ভূমিদস্যু ও পুঁজিপতিরা চিরদিনই জিতে যায়।

গল্পে বজ্র, বৃষ্টি, বিল, সাপ, গরু ইত্যাদি যেন এক-একটি চরিত্র হয়ে গল্পের অভ্যন্তরে মানবজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গিয়ে মানবভাগ্যের প্রধান পরিচালক হয়ে উঠেছে। মৃত্তিকা-সংলগ্ন শুদ্ধ মানুষের অন্তহীন জয়-পরাজয় ফুটে উঠে মানবভাগ্যেরই অসহায় সত্য পরিণাম—

> "জোতদারশোষিত করমালির দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে ফনা তোলা গোক্ষুর সাপটি যেন তার কামনা-বাসনা, সংকট -সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের প্রতীক।"[৬]

করমালি, করমালির স্ত্রী, রহমালি, করমালির পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা মা— এরা প্রত্যেকেই জীবনসংগ্রামে অনবদ্য সাহস দেখিয়েছে। এই দুঃসাহস, বেঁচে থাকার লড়াই, সাপ ও প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম তাদের জীবনবোধকে মহৎ করে তুলেছে। বৃষ্টিতে করমালির স্ত্রীর হাতে থাকা গোবরের তালের মতো করমালির জীবন সহজে গলে পড়েনি, সে একজন অপরাজেয় ক্ষত্রিয়। রোদে পোড়া, জলে ভেজা অখণ্ড বাংলাদেশের কৃষক সমাজের প্রতিনিধি এই করমালির জীবন প্রকৃতির রুদ্ররোষ কেড়ে নিলেও, আমৃত্যু সে সংগ্রাম করে গেছে—

> "বাংলার আপামর জনগণের আমৃত্যু আজীবন শোষণ ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে টিকে থাকার মর্মস্পর্শী সংগ্রাম এ গল্পের সমগ্র পরিসরকে মহাকাব্যিক মর্যাদা দান করে। এ গল্পের করমালি প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লড়াই করে গিয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিভাসিত হয় যে, পরাজয় স্বীকারের জন্য মানুষের জন্ম নয়।"[৭]

হাসান আজিজুল হকের কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত রাঢ়প্রকৃতির বাস্তবচিত্র 'জীবন ঘষে আগুন' গল্প। পুরোহিত-শাসিত বাবু শ্রেণীর বিপরীতে তেঁতুলে বাগ্দীদের জীবনসংগ্রামকে একই প্লাটফর্মে দাঁড় করিয়ে সমাজ জীবনের কুৎসিত চেহারাটি নিরাভরণ করে দিলেন লেখক। দেশ-কাল-প্রকৃতি ও সমাজের প্রেক্ষাপটে প্রাচীন সংস্কারের ও পটভূমিতে গল্পটির বিষয়বস্তকে বিবেচনায় না আনলে লেখকের মূল উদ্দেশ্যের সাথে মিলানো যাবে না। 'জীবন ঘষে আগুন' গল্পটির পটভূমি বাংলার খরাকবলিত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত লেখকের গ্রামসংলগ্ন একটি মেলা। এই মেলাকে কেন্দ্র করে গল্পটি রচিত হলেও তৎকালীন সমাজের জায়মান বাস্তবতার চিত্রটি লেখক দার্পণিক মেজাজে ফুটিয়ে তুলেছেন—

> "একটি গ্রামীণ মেলাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও গল্পাংশে লেখক মিলিয়ে দিয়েছেন সমকালীন জীবনের স্পন্দনের সঙ্গে।"[৮]

অর্থাৎ শোষিত বঞ্চিত মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উজ্জীবিত হওয়ার গল্প 'জীবন ঘষে আগুন'। একদিকে নিষ্ঠুর প্রকৃতি অন্যদিকে পুরোহিত ও কায়েমি স্বার্থবাদীর লাভ-লোভের ফাঁদ দুইদিক থেকে শোষণের শিকার অন্ত্যজ মানুষেরা জীবনধর্মের নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হয় চিরকাল। আর তখন প্রকৃতির কাছ থেকেই দীক্ষা-শিক্ষা পেয়ে জমাট বরফের মতো দিনে দিনে অন্ত্যজের ভিতরে জমে ক্ষোভ আর রোষের ভয়ানক বারুদ। যোগ্য নেতৃত্ব পেলে এই বারুদ জ্বলে উঠতে পারে ভয়ানক লেলিহান হয়ে। সমাজ জীবনের এক গভীর উপলব্ধি থেকে লেখক জেনেছেন— এই বিরোধের মীমাংসা কোথায়? একটাই মীমাংসার পথ খোলা আছে— শোষণের যূপকাষ্ঠ ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া। শোষকের বিষদাঁত সমূলে উৎপাটন করে শোষণলিপ্সু সমাজ কাঠামোকে নির্দয় আঘাতের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা।

এ গল্পের সুবিশাল পরিসরে পশ্চিমবঙ্গের খরা ও দুর্ভিক্ষ কবলিত রাঢ় অঞ্চলের একটি গ্রামের ধূসর প্রকৃতি, সমাজব্যবস্থা ও মেলার বিবরণ দেয়া হয়েছে। গল্পকার তাঁর 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের 'জায়গা জমি মানুষ' প্রবন্ধে রাঢ়বঙ্গের মানুষ ও প্রকৃতির যে বর্ণনা রয়েছে তা এই গল্পের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ—

> "আমাদের দেশ ছিল রুখো কর্কশ। গাছপালা প্রায় নেই। খুব বড়ো বড়ো মাঠ তেপান্তর যাকে বলে। গরমের দিনে ঘাস জ্বলে যায়। মাটির রং হয় পোড়া তামাটে। শরতে সেই মাটিকেই দেখি হারের মতো সাদা। তবে বর্ষায় কুচকুচে কালো রং এর মাটিও দেখেছি। তিন মাইল চার মাইল লম্বা মাঠ ন্যাড়া। ...এই দেশ যেন দুর্ভিক্ষ আর খিদের জন্য তৈরি হয়েই আছে। কারণ এখানে মানুষও বাস করে। পোড়া কালো রং এর পাকানো পেশী বের করা মানুষ, রাঢ়ের মানুষ, এই রাঢ়ীয় প্রকৃতিতে বাস করে। ...পৃথিবীতে খাদ্য আছে, বস্ত্র আছে, বিচিত্র ঘরবাড়ি, মানুষের হাজার হাজার বছরের সভ্যতা আছে। রাঢ় তা জানে না। ...রাঢ় হচ্ছে ধান কেটে নিয়ে যাবার পর জমির নাড়া, চৈত্র মাসের শুকনো এলোমেলো বাতাস, শাদা ধুলো।"[৯]

প্রবন্ধে উল্লিখিত রাঢ়বঙ্গের এই চিত্র জীবন ঘষে আগুন গল্পের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ গল্পে একইসঙ্গে রাঢ়বঙ্গের নিম্নশ্রেণি, উচ্চশ্রেণি ও মুসলমান সমাজকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। রাঢ়বঙ্গের টাঁকসোন, রতনপুর, ঢেঁড়িয়ে, ঠ্যাঙাগড় প্রভৃতি অঞ্চলের প্রকৃতি যেমন নির্মম, মানুষও তেমনি সংগ্রামী। ধূসর মাঠ, বৃষ্টিহীন খরার মাটি, তীর্যক রোদকে উপেক্ষা করে তারা ফসল ফলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু উচ্চবিত্ত শ্রেণি নিষ্ঠুর ছোবলে ফসলের প্রায় সিংহভাগ করায়ত্ত করে। তাই অনাহারে ক্লিষ্ট হয়ে হাড়হাবাতের মতো পথে পথে ঘুরতে হয় নিম্নশ্রেণিকে। মেলা উপলক্ষে উচ্চবিত্ত বাবুরা যখন হাতির পিঠে চড়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে যাত্রা করে তখন হাড় শুকানো এ সকল লোক হৃষ্টপুষ্ট হাতি পেট ও মোটা নধরকান্তি বাবুদের করুণ চোখে চেয়ে দেখে। মুসলমান বালকরা হাতির পা রাখা মাটিতে গড়াগড়ি দেয় শরীরটাকে একটা তাজা করতে—

"সেইসব রাখাল বালকদের সবাই তখন মাটিতে লুটোপুটি খায়, হাতির মতুন গোদা করে দাও গো আল্লা— হেই আল্লা।"[১০]

কঙ্কালসার মানুষের এ হাহাকার মিশ্রিত কণ্ঠস্বর মানবতার জন্য চরম অবমাননাকর। কেননা, উচ্চবিত্তেরা মর্যাদা বাড়াতে হাতির মত প্রাণির উদরপূর্তি করতে পারে কিন্তু অনাহারী জনতার মুখে খাবার তুলে নিতে পারে না। এ কারণে অসহায় বালকেরা বাবুদের পরিবর্তে হাতিটিকেই শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি মনে করে প্রতিবাদ করে ওঠে —

"জমির ধানের ভাগ লিবি লিকি রে ভুঁরিঅয়লা মহাজোন? এগু কল্লা দে।"[১১]

শোষিত পক্ষ সর্বদা নিশ্চুপ থাকে বলে উচ্চবিত্তরা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করার সুযোগ পায়। কিন্তু তারা জানে যে প্রজারা একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠলে কারও নিস্তার নেই। তাই বাবুরা ভয়ার্ত সুরে বলে—

"শালারা সব ভাদুরে কুকুরের মতো হয়ে আছে— একবার যদি ক্ষ্যাপে ছিঁড়ে ফেলবে একদম।"[১২]

এই গল্পে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ বৃদ্ধ অভিরাম যুগ যুগ বাহিত শোষণের চাপে বিমথিত। পুরোহিত- শাসিত সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না সে। কিন্তু তার উত্তরপুরুষ নতুন প্রজন্মের সাহসী সন্তান মনোহর বিদ্রোহকে পরমসত্য বলে জেনেছে। সে মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করেনি, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। উঁচুশ্রেণির ঘন্টাবাবু নিম্নবর্গের রমণী কালীর অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে, তার শরীরকে ভোগ করেছে। যুবক মনোহর প্রতিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় ঘন্টাবাবুকে হত্যা করেছে। এবং সেই হত্যাকে তারা নিজেদের অস্তিত্বের সংগ্রামে সঙ্গে অন্বিত করে দেখেছে এভাবেই—

"তবে মৃত্যু কি জীবনে একবারই আসে না? এবং সেইসব বদমরণ মরতে যে দুঃসহ ক্লান্তিতে ভুগতে হয়— তার চেয়ে একটি উজ্জ্বল হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধ কি প্রচন্ডভাবেই না কাম্য।"[১৩]

তারাশঙ্করের পরে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে রাঢ়ের উত্তরাধিকার হিসাবে হাসান আজিজুল হকের নাম আসে। পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, সামাজিক বৈষম্য, খাদ্য ও অর্থ সংকট ইত্যাদি হাসানের অসংখ্য গল্পের বিষয়। 'জীবন ঘষে আগুন' গল্পে লেখক প্রকৃতিকে যখন রুক্ষ ও বিবর্ণরূপে দেখেন, তখন সেই প্রকৃতির চেহারা ও স্বরূপ বদলে যায়। স্নিগ্ধতা ও কোমলতার সামান্যতম পরিচয় সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রকৃতি হয়েছে মানুষের কঠিন জীবনের সমান্তরালে। রাঢ় অঞ্চলের প্রাকৃতিক রুক্ষতা মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রাখর্যকে ব্যঞ্জনা দিয়েছে—

"সেখানে কোনো বৃক্ষ ছিল না, কোনো বট বা অশ্বত্থ—শুধু কিছু কাঁটাগাছ, পানসে ছায়া বাবলা, বড়জোড় শেয়াকুল ধরনের গুল্ম এইসব মাঝে মাঝে। আর অনেক বড় লাল মাঠ —গরমের তাড়সে পীড়িত অসংখ্য গর্ত।"[১৪]

কিংবা—

"সূর্যের গোলাটি মন্ত্রবলেই যেন আকাশের মাথায় উঠে এসেছে—মরণরত শূকর তাকে আহ্বাণ জানায়, সে প্রত্যুষের স্নিগ্ধতা ছিঁড়েখুঁড়ে চোখ রাঙিয়ে বেরিয়ে আসে—মুহূর্তেই হাওয়া অদৃশ্য উজ্জ্বল তামার পাতে পরিণত হয় —পাখিগুলো ভেগেছে, আর উপায় কি?"[১৫]

উপরিউক্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে হাসান আজিজুল হক দাহ্য প্রকৃতির প্রতপ্ত অগ্নিময় সত্তাকে প্রত্যাসন্ন সংগ্রামের প্রবল উত্তেজনার সাথে সমন্বিত করেছেন। গল্পের সামগ্রিক আয়তনের মধ্যে প্রকৃতি নানারূপে বারবার এসেছে এবং দেখা যায় তিনি প্রকৃতি বর্ণনার প্রায় সবটুকু অংশ জুড়ে আসন্ন বিস্ফোরণের সম্ভাবনাকে উত্তরোত্তর ঘনীভূত করেছেন। প্রকৃতির কঠোরতা ও বিরূপতার কাছে দীক্ষা নিয়ে সংগ্রামী মানসিকতায় এইসমস্ত হাড়হাভাতে মানুষেরা উচ্চবিত্ত শ্রেণির সমস্ত ঔদ্ধত্যকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে জীবন ঘষে আগুন জ্বালাবার মত দুরূহ কাজ মেতে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> "হাসানের প্রকৃতি-চিন্তার মূল সুরটি কর্মচঞ্চল মানুষের জীবনের উত্তাপে সঞ্জীবিত—অর্থাৎ হাসান কর্মচঞ্চল মানুষের পাশাপাশি এনেছেন সজীব ও প্রানবন্ত প্রকৃতির নিগূঢ় রূপবৈচিত্র্যেকে, রূপের সেই অফুরন্ত ঐশ্বর্যের দ্বারা মানুষের কর্মধারা বিপুলভাবে আন্দোলিত হয়, নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি প্রকৃতিকে বিপ্রতীপ তৎপর্যে টেনে এনেছেন। প্রকৃতি তার কাছে কখনো কখনো ভয়ঙ্করভাবে ক্রুর ও ছলনাময়ী। কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার দুরন্ত স্পৃহা বা তৃষ্ণা প্রকৃতির সেই ছলনাকে জয় করার আশ্চর্য শক্তি জুগিয়ে থাকে। নতুন নতুন মাত্রায় প্রকৃতির নব নব রূপকে উন্মোচিত বা অবারিত করতে গিয়ে হাসান জীবনোপলব্ধির প্রসারতা যেভাবে ঘটিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।"[১৬]

প্রকৃতি তাঁর গল্পের সামগ্রিক আয়তনে যতখানি জায়গা পেয়েছে তার সবটুকুতেই মানুষের জীবননাট্যেরই ঐক্যতান— কখনো তা আশ্চর্য সাদৃশ্যে আবার কখনো তা ব্যাপকতার বৈপরীত্যের তাৎপর্যে চিত্রায়িত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী লেখক মনে করেন, প্রকৃতি কেবল সুন্দর নয়, প্রকৃতি মানুষকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার অগ্নিমন্ত্রও শিখিয়েছে। রাঢ়বঙ্গ- দক্ষিণবঙ্গ-উত্তরবঙ্গ এই তিন ভূখণ্ডের বদলে যাওয়া প্রকৃতি, জীবনবীক্ষা সবই হাসানের গল্পে ফাইলবন্দি হয়েছে একটা স্থির প্রত্যয় নিয়ে, যা আঞ্চলিকতার দোষ থেকে আশ্চর্যরকমভাবে মুক্ত হয়ে শাশ্বতভাবে আধুনিক। তাঁর গল্পে প্রকৃতির স্নিগ্ধতা ও কোমলতা সংগ্রামী জীবনের সামনে বিরাট আশীর্বাদস্বরূপ, যা জীবনকে সতেজ-সুন্দর-কর্মোদ্যমী করে।তেমনি প্রকৃতির অগ্নিসত্তা বিপ্লব-বিদ্রোহের উন্মাদনা ও প্রেরণা জোগায়, আশ্রয়-প্রশ্রয়-লালন করে। আর যে কারণেই, ছোটগল্পের লেখক হয়েও রবীন্দ্রনাথ-বিভূতির পরের হলেও হাসান কোনপ্রকার ভাবাবেগের জ্বরে আক্রান্ত না হয়ে চালু সময়ের নির্মেদ জীবনকে নির্মেদ প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করেছেন। সুস্থ-সুন্দর, সুখ-শান্তির জীবনের জন্য মানুষকে যেতেই হবে প্রকৃতির মুক্তপাঠশালায়, তৈরি করে নিতে হবে ঐক্য।

তথ্যসূত্র :

১. হোসেন, মোহাম্মদ জাহিদ : বাংলাদেশের ছোটগল্প জীবন ও সমাজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯৭, পৃ. ৫৬
২. হক, হাসান আজিজুল : গল্পসমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃ. ১৮
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭
৬. বোস, চঞ্চলকুমার : বাংলাদেশের ছোটগল্প জীবনজলধির শিল্প, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, একুশের বইমেলা, ২০১৬, পৃ. ২০৬
৭. শারমিন, জীনাত : হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প : বিষয় ও শিল্পরূপ, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৮২
৮. আজীজ, মহীবুল : হাসান আজিজুল হক:রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার, অচিরা প্রকাশনী, ৪৬, বৌদ্ধ মন্দির সড়ক, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯৫, পৃ. ৫৭
৯. হক, হাসান আজিজুল : চলচ্চিত্রের খুঁটিনাটি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা-৪৫
১০. হক, হাসান আজিজুল : গল্পসমগ্র ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭
১৩. হক, হাসান আজিজুল : রাঢ়বঙ্গের গল্প, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯৮, পৃ. ৯৩
১৪. হক, হাসান আজিজুল: গল্পসমগ্র ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩
১৬. জাফর, আবু : হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজ বাস্তবতা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৮